নদীসংযোগ ইস্যুতে ভারতের আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই

আরিফ খান মিরণ

নদীসংযোগ হলো ভারতের বড় বড় নদীগুলো থেকে পানি টেনে আনার জন্য ৩৬টি নদীর সংযোগ প্রকল্প। নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি। এর আওতায় বেশ কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ ও ১ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ৪ হাজার ৫০০ কিলোমিটার হিমালয়ান পানিপথকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সব পানিপ্রবাহের সঙ্গে মিলিত করা হবে এ প্রকল্পের অধীনে।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

টেক্সাসের ভারতীয় পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার স্যাম ক্যান্নাপানের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে অর্থলগ্নি করে। নদীসংযোগ বিষয়ে ভারত ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক নদী আইন বিশেষজ্ঞ ড. আসিফ নজরুল বলেন, নদীসংযোগ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তার আপত্তির কথা ভারতকে জানিয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে জানিয়েছিল যে, প্রকল্পটি এখনো ধারণার পর্যায়ে রয়েছে এবং এ নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের কিছু নেই। কিন্তু নদীসংযোগ যে 'প্রকল্প' পর্যায়ে রয়েছে, 'ধারণা' পর্যায়ে নয়, তার সপক্ষে বহু তথ্যপ্রমাণ ভারত নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের ১৪টি সংযোগ খালের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই সংযোগগুলোর একটি কেন-বেতওয়া নদীসংযোগ নির্মাণের বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রী একটি সমঝোতা স্মারকও সম্পাদন করেছেন। ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৬ আগস্ট সংখ্যায় এ চুক্তি সম্পাদনকে নদীসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর আগে ১৪ আগস্টে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার পরিবেশিত একটি সংবাদে বলা হয় যে, ভারতের প্রেসিডেন্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে এই 'প্রকল্প' জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন এবং এ লক্ষ্যে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার কথা বলেছেন।

প্রকল্প শুরু হয়ে গেছে

গত সেপ্টেম্বরে কেন এবং বেতওয়া নদীসংযোগের জন্য উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এর মধ্য দিয়ে আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হলো। যারা মনে করেন কেন-বেতওয়া বাঁধের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সংযোগ নেই, অতএব উদ্বিগ্ন হওয়ারও কিছু নেই- তাদের কথায় ফাঁক আছে। কেননা, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের মতো অন্যান্য রাজ্যও সিরিয়ালে আছে, সেখানে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে এবং প্রকল্পের কাজ শুরু হবে, তখন বাংলাদেশও এ দুষ্টচক্রের শিকার হবে। এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের পরিবেশ ও বাস্তু-ব্যবস্থাপনার ওপর।

ম্যাপে লাল মোটা দাগগুলোই হলো ভারতের নদী সংযোগ লাইন। বাংলাদেশের চারপাশ ঘিরে আছে বাঁধের লাইন, তারপরও বা হচ্ছে হিমালয়ান নদীগুলো সংযোগ করা হবে না- এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

বাংলাদেশের কী হবে

বাংলাদেশের ২৫০টি নদীর প্রায় সবগুলোরই উৎপত্তি হিমালয় পর্বতে। সেখান থেকে নদীগুলো ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন ভারত যদি তার নদীসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং এতে করে যদি ১০ থেকে ২০ শতাংশ পানিও হ্রাস পায়, তাহলে বাংলাদেশের একটা বিশাল অঞ্চল বছরের বেশির ভাগ সময়ের জন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে। বাংলাদেশের ২০ মিলিয়ন ছোটখাটো কৃষকের ৮০ শতাংশেরও বেশি কৃষক ভারত থেকে বয়ে আসা নদীর পানি দিয়ে তাদের কৃষিকাজ করেন।

বাংলাদেশের আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই

গত সপ্তায় বাংলাদেশ সফরে এসে ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি নদীসংযোগ প্রকল্প বিষয়ে অনেক কথা বলে গেছেন। সবচেয়ে বেশি যে কথাটি তিনি বলেছেন সেটি হলো, 'ভারত হিমালয়ান কমপোনেন্টের নদীগুলো সংযোগ করবে না। যদি করে তাহলে বাংলাদেশের আগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ইত্যাদি রাজ্য। অতএব বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।' তার এ বক্তব্য মৌখিক সান্ত্বনাবাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ভারত তার নদীসংযোগ মহাপরিকল্পনাকে ভৌগোলিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এর একটি হলো হিমালয়ান রিভার কমপোনেন্ট আর অন্যটি হলো পেনিনসুলার রিভার কমপোনেন্ট। এই দুটি কমপোনেন্টই একটি একক প্রকল্পের (সিঙ্গল প্রজেক্ট) অধীন। সুতরাং এখন পেনিনসুলার কমপোনেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, পরে হিমালয়ান প্রকল্পের কাজও শুরু হবে। অথচ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বাংলাদেশের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গেলেন। ড. আসিফ নজরুলের ভাষায়, 'এসব সংবাদে বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ বেড়েছে। কিন্তু নদী কমিশনের বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সফরের আগে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রী বাংলাদেশের উদ্বেগের সঙ্গে একমত হননি। তার বক্তব্য : 'ভারত সরকার কেবল দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোর সংযোগের ব্যাপারে মনোযোগ দিচ্ছে। হিমালয় অঞ্চলের নদীগুলো সংযোগের বিষয়ে এখনো আলাপ-আলোচনাই করেনি। তাই বাংলাদেশের

উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রীর এ বক্তব্যে আশ্বস্ত হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই কেন তা নদীসংযোগ প্রকল্পের তথ্য বিবরণী থেকেই বোঝা যাবে। ২০০৩ সালে ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত 'ইন্টার-বেসিন ওয়াটার ট্রান্সফার প্রোপোজালস' অনুসারে নদীসংযোগ প্রকল্পের দুটো কমপোনেন্টের একটি হিমালয়ান রিভার কমপোনেন্ট, অন্যটি পেনিনসুলার রিভার কমপোনেন্ট (যাকে দক্ষিণাঞ্চল নদী হিসেবেও অভিহিত করা হয়)। এই দুটো কমপোনেন্ট একটি অভিন্ন প্রকল্পের অবিভাজ্য (inseparable components of a single project) অংশ। হিমালয়ান কমপোনেন্টের নদীগুলোর মধ্যে যে ১৪টি সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তার দুটো হচ্ছে গঙ্গা-দামোদর-সুবর্ণরেখা এবং সুবর্ণরেখা-মহানদী। অন্যদিকে পেনিনসুলার কমপোনেন্টে পরিকল্পিত ১৭টি সংযোগের মধ্যে রয়েছে মহানদী-গোদাভেরি ও গোদাভেরি-কৃষ্ণ সংযোগ। কাজেই গঙ্গা-দামোদর-সুবর্ণরেখা-মহানদী সংযোগের মাধ্যমে হিমালয়ান নদীগুলোর পানি যে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করা হবে না, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। হিমালয়ান কমপোনেন্টে মানস-সাংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা নামের সংযোগ নির্মাণের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গার উজানে টেনে নেয়ার যে পরিকল্পনা ভারতের রয়েছে, তাতেও বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন বোধ করা স্বাভাবিক।

ভারত কখনো বলেনি বা ভারত কর্তৃক প্রকাশিত কোনো দলিলে নেই যে, আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্পের শুধু পেনিনসুলার কমপোনেন্টের সংযোগগুলোই ভারত নির্মাণ করবে। বলেনি যে, হিমালয়ান সংযোগগুলো কখনোই নির্মাণ করা হবে না বা বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে চুক্তি না হলে এগুলো নির্মাণ করা হবে না। পানিসম্পদ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বহু বছরের বিরোধের কথা যারা জানেন, তারা এ-ও জানেন, এ ধরনের কিছু বলা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু উত্তরপ্রদেশ, বিহার আর মধ্যপ্রদেশের পানি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে টেনে নেয়ার প্রকল্প কিছুতেই এই রাজ্যগুলো মেনে নেবে না, যদি না তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকে যে, নদীসংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি তাদের সরবরাহ করা হবে।'

ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রীর মন্তব্য যে কতটা ভাসা ভাসা এবং প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য তা স্পষ্ট হয় চার দিনের সরকারি সফর শেষে যৌথ কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা নিয়ে। তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণকে বাংলাদেশ কার্যবিবরণীতে অগ্রাধিকার দিতে চাইলে ভারত তাতে রাজি হয় না। অবশেষে রাতভর আলোচনা চালিয়ে ভোর পাঁচটায় তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ে দুই দেশ একটু ছাড় দিতে রাজি হয় এবং প্রকল্পটি আরো পরীক্ষার জন্য দুই দেশের সচিব পর্যায়ে ঠেলে দেয়া হয়। আর রাতভর আলোচনা করেও বাংলাদেশের সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ যেটি অর্থাৎ নদীসংযোগ প্রকল্প, সেটির জায়গা যৌথ কার্যবিবরণীর মূল অংশেও হয়নি। এর জায়গা হয়েছে যৌথ কার্যবিবরণীর একেবারে শেষে 'অন্যান্য' (আদারস্) বলে যে কোটা থাকে সেখানে। এ ঘটনা থেকে ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রীর 'আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্প দুই হাজার বছরেও বাস্তবায়ন করা হবে না' এ মন্তব্যকে ঠাট্টা বলে মনে হয়।

ফারাক্কা বাঁধের বেলায়ও ভারত বলেছিল এটি একটি 'পরীক্ষামূলক প্রকল্প', কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল সেই পরীক্ষা আর শেষ হয়নি। তা আজও বাংলাদেশের বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে। যখন প্রয়োজন তখন পানি থাকে না যমুনা নদীতে। যারা ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রীর এ আশ্বাস শুনে আশ্বস্ত যে 'ভারত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ নির্মাণ করতে যাচ্ছে না-' অতএব বাংলাদেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, তাদের জানা থাকা দরকার মুখে বললেও ভারত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে না। কারণ বর্তমান নদীসংযোগ প্রকল্প ১৯৭০ দশকের ফারাক্কা প্রকল্পেরই ধারাবাহিকতা। এর প্রমাণ হিসেবে ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (এনডব্লিউডিএ) ডিরেক্টর জেনারেল রাধা সিং এর একটি মন্তব্য লক্ষ্য করুন, 'প্রকৃতপক্ষে এটি (নদীসংযোগ প্রকল্পটি) কে এল রাওয়ের আগে উত্থাপিত পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে।' কে এল রাও ছিলেন জওহরলাল নেহরুর ক্যাবিনেটের সেচমন্ত্রী। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ফারাক্কা প্রকল্পেরই বর্ধিত রূপ হলো বাস্তবায়নাধীন নদীসংযোগ প্রকল্প।

'কিন্তু নদীসংযোগ যে 'প্রকল্প' পর্যায়ে রয়েছে, 'ধারণা' পর্যায়ে নয়, তার সপক্ষে বহু তথ্যপ্রমাণ ভারত নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রকল্পের ইতিমধ্যে ১৪টি সংযোগ খালের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে'

- অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল

আন্তর্জাতিক নদীআইন বিশেষজ্ঞ, আইন বিভাগ, ঢাবি

ভারতকে অবিশ্বাসের কারণ

এখন কথা হলো একথা সুস্পষ্ট যে, নদীসংযোগের জন্য বাংলাদেশকে চরম মূল্য দিতে হবে। এর পরও কি ভারত একাজ করবে? অতীতে বাংলাদেশকে না জানিয়েই ভারত তার নদীসংযোগের বা বাঁধের কাজ করেছে। তাই শুধু মৌখিক আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ভারতকে আর বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

কলকাতা বন্দরকে পলির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত কর্তৃক প্রায় ১৮ মাইল উজানে মনোহরপুরের কাছে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক ও ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ভারত কর্তৃক গঙ্গার পানির একতরফা প্রত্যাহার বাংলাদেশের কেবল প্রতিবেশ ও পরিবেশ ব্যবস্থাই ধ্বংস করছে না বরং এ দেশের কৃষি, শিল্প, বনসম্পদ ও নৌযোগাযোগের মতো অর্থনৈতিক খাতগুলোর ওপরও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৫১ সালের ২৯ অক্টোবর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রথমারের মতো পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদী থেকে বিপুল পরিমাণ পানি প্রত্যাহারের ভারতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে গঙ্গার বিষয়টি সবার নজরে আসে। ১৯৫২ সালে প্রত্যুত্তরে ভারত জানায় যে, পরিকল্পনাটি *মাত্র প্রাথমিক* পর্যায়ে রয়েছে এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাকিস্তানের উদ্বেগ সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। এ ঘটনা থেকেই গঙ্গার জলবণ্টন-সংক্রান্ত আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাসের সূত্রপাত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারত সরকার বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সরকারপ্রধান পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে গঙ্গার প্রবাহ বণ্টনের ব্যাপারে বহুবার আলোচনায় বসেছে। ইতিমধ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১৮ কি.মি. উজানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করেছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে গঙ্গা প্রশ্নে জরুরি আন্তরিক আলোচনা শুরু করে। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (JRC)। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এক যৌথ ঘোষণায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, ফারাক্কা প্রকল্প চালু করার আগে গঙ্গায় বছরে সর্বনিম্ন প্রবাহের সময়কালে নদীর জলবণ্টন প্রশ্নে তারা পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য একটি মতৈক্যে উপনীত হবেন। এ শীর্ষ বৈঠকে আরও স্থির হয় যে, শুষ্ক মৌসুমের পানি ভাগাভাগির পর্যায়ে দু'দেশের মধ্যে কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়ার আগে ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হবে না। ১৯৭৫ সালে ভারত বাংলাদেশকে জানায় যে, ফারাক্কা বাঁধের ফিডার ক্যানাল পরীক্ষা করা তাদের প্রয়োজন। সে সময় ভারত ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১০ দিন ফারাক্কা থেকে ৩১০-৪৫০ কিউবিক মিটার/সেকেন্ড গঙ্গার প্রবাহ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে বাংলাদেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। বাংলাদেশ সরল বিশ্বাসে এতে সম্মতি দেয়। ভারত বাঁধ চালু করে দেয় এবং নির্ধারিত

সময়ের পরেও একতরফাভাবে গঙ্গার গতি পরিবর্তন করতে থাকে, যা ১৯৭৬ সালে পুরো শুষ্ক মৌসুম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়নে পলি ধুয়ে নিতে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদী থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী-হুগলী নদীতে ১১৩০ কিউবিক মিটারের বেশি পানি পৌঁছে দেয়া।

ভারতকে এ কাজ থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয়। ১৯৭৬ সালের ২৬ নবেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি সর্বসম্মত বিবৃতি গৃহীত হয়, যাতে অন্যান্যের মধ্যে ভারতকে সমস্যার একটি ন্যায্য ও দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসার নির্দেশ দেয়া হয়। এর জের ধরে কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৭ সালের ৫ নবেম্বর দুই দেশ ফারাক্কায় প্রাপ্ত শুষ্ক মৌসুমের জলবণ্টনের ওপর ৫ বছরমেয়াদি (১৯৭৮-৮২) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে দুই দেশের মধ্যে ১৯৮৩ ও '৮৪ সালের জন্য গঙ্গার জলবণ্টন-সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। কোনো সমঝোতা চুক্তি না থাকায় ১৯৮৫ সালে গঙ্গার জলের ভাগবাটোয়ারা হয়নি। ১৯৮৫ সালের নবেম্বর মাসে দুই দেশের মধ্যে ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ এই তিন বছরের জন্য পানি বন্টনের ওপর আরেকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বণ্টন-সংক্রান্ত এই অস্থায়ী ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এলাকায় বিভিন্ন খাতে গঙ্গার পানির আরো অর্থবহ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে আবার বৈঠকে মিলিত হন, কিন্তু বাংলাদেশকে অযথা হয়রানি থেকে মুক্তি দেয়ার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আগের মতো অপূর্ণই থেকে গেল। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন- সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়। বর্তমানে এই চুক্তিও ভারতের অনীহার কারণে খুব একটা সচল নেই।

নদীসংযোগ ও পাওয়ার পলিটিক্স

একটি মামলার প্রেক্ষিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট খরাপীড়িত এলাকায় নদীসংযোগের মাধ্যমে পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিল। তখন ভারতের ক্ষমতার আসীন ছিল বাজপেয়ীর ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপি সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। খরাপীড়িত রাজ্যগুলোর ভোট পাওয়ার আশায় তারা প্রায়- মৃত নদীসংযোগ প্রকল্পকে রঙেচঙে সাজিয়ে বিশাল করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করল। যা হোক বিজেপি ভোটে পাস করতে পারেনি। কিন্তু নদীসংযোগ প্রকল্প বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। বরং পেয়েছে নতুন মাত্রা। এখন ভারত সোজা

পানিসম্পদমন্ত্রী হাফিজ উদ্দীন আহমেদ ও ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি চার দিন আলোচনা শেষে যৌথ কার্যবিবরনীতে স্বাক্ষর করছেন। অতচ কার্যবিবরনীর মূল ধারায় নদী সংযোগ ইস্যুর কোনো উল্লেখই নেই

হিসেবে দেখাচ্ছে, নদীসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে ৩৫ থেকে ৩৭ মিলিয়ন হেক্টর নতুন আবাদী জমি তৈরি হবে, ৩৪ হাজার মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে (?) এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে আন্তঃনদীবাণিজ্য, যাতায়াত ও পরিবহনের ক্ষেত্রে স্বর্ণদ্বার খুলে যাবে। আর এজন্য যদি নেপাল, বাংলাদেশ মরুভূমি হয়ে যায় তো যাক! নদীসংযোগ প্রকল্পকে যদি কেউ নিতান্তই খড়া সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখেন তাহলে প্রকৃত সত্যের সামান্যও দেখা হবে না। ভারতের কাছে নদীসংযোগ এখন একটি মারাত্মক ফলদায়ক পলিটিক্যাল কার্ড। নব্য উত্থিত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নদীসংযোগের মাধ্যমে সে তার তিন প্রতিবেশীর (বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান) ওপর অবাধে ছড়ি ঘুরাতে পারবে। (অবশ্য ভুটান ইতোমধ্যে ভারতের খপ্পরে পড়ে গেছে।)

আন্তর্জাতিক আইন কী বলে

আন্তর্জাতিক আইনের রীতিনীতি, প্রথা, বিধি ইত্যাদির বিচারেও ভারতের একতরফা নদীসংযোগ পরিকল্পনা বেআইনি। 'আন্তর্জাতিক আইন প্রজেক্টে'র একটি নীতির (Principle) ব্যাখ্যায় আছে, 'সিইক য়াটার টেওঅ য়াট এলইএনাম নঅন লেএডাস'। যার অর্থ হলো, 'অনুমান সম্ভব ক্ষতিকর কাজ না করার বাধ্যবাধকতা।' অর্থাৎ যে ক্ষতি সহজেই অনুমান করা যায় এবং কোনো পদক্ষেপ সেই ক্ষতি ঘটতে পারে এমন কোনো কাজই করা যাবে না।

প্রথাভিত্তিক আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক করেছে যে কোনো রাষ্ট্রই অন্য দেশের অধিকারকে খর্ব করে এমন কোনো পদক্ষেপ নিবে না এবং পদক্ষেপ নেয়ার অনুমতি দিবে না। 'সিইক য়াটার টেওঅ য়াট এলইএনাম নঅন লেএডাস' নীতিটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের একটি সাধারণ নীতি হিসেবে স্বীকৃত এবং বিশ্বব্যাপীও এর স্বীকৃতি রয়েছে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক আইনের বিবরণীতে বলা হয় ব্যাসিন স্টেটের (যে দেশে পানি জমা থাকে) যেকোনো উদ্যোগ সহব্যাসিন (Co-basin) স্টেটের প্রাপ্যতা অধিকারকে লঙ্ঘন করে। হোক সে সহব্যাসিন স্টেট (এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ) ভূমিগত দিক দিয়ে উচ্চে অথবা নিম্নে। তাই এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওপর এ প্রকল্পের প্রভাব হবে খুবই ভয়াবহ। এই ভয়াবহতা আন্তর্জাতিক আইনে সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ।

অকার্যকর যৌথ নদী কমিশন

এ প্রসঙ্গেও ড. আসিফ নজরুল বলেন, গত সপ্তায় হয়ে যাওয়া বৈঠকটি ছিল কমিশনের ৩৬তম বৈঠক। কমিশনের স্ট্যাটিউট অনুসারে এর বৈঠক হওয়ার কথা প্রতি বছরে চারটি। ১৯৭২ সালে যখন কমিশন গঠন করা হয় তখন এটিও স্থির করা হয়েছিল যে, কমিশন বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ সম্পর্কিত যৌথ প্রকল্প যাচাই ও প্রণয়ন করবে এবং এসব প্রকল্পের লক্ষ্য হবে দু দেশের জনগণের কল্যাণে পানিসম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা। বাস্তবে গত ৩৩ বছরে কমিশনের মাত্র ৩৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনো কমিশন কোনো ধরনের যৌথ প্রকল্প প্রণয়ন বা এ লক্ষ্যে কোনো অর্থবহ আলোচনা শুরু করতে পারেনি। কমিশনের সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'বছর আগে এবং এই সময়ের মধ্যে ভারত তার আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্প এবং টিপাইমুখী ড্যাম প্রকল্পের বিষয়ে বেশকিছু একতরফা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের কী করা উচিত

নদীসংযোগ প্রকল্প নিয়ে তাই বাংলাদেশের অবশ্যই উদ্বেগের কারণ রয়েছে। উচ্চ অববাহিকার দেশ হিসেবে এই উদ্বেগ প্রশমনের দায়িত্ব ভারতের। নদীসংযোগ ও টিপাইমুখী প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করে এবং নদী কমিশনের বৈঠকে এসব প্রকল্প নিয়ে অর্থবহ, আন্তরিক ও খোলামেলা আলোচনা করার মাধ্যমেই কেবল এই উদ্বেগ প্রশমন সম্ভব। তবে শুধু মুখের কথা নয়, আমরা চাই ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রী মুখে যা বলেছেন নদীসংযোগ প্রকল্পের কাগজপত্রেও তার প্রমাণ দিবেন। এবং ভারত যে কোনোদিন হিমালয়ান কম্পোনেন্টের নদীগুলো সংযোগ করবে না- এ বিষয়ে লিখিত ঘোষণামূলক কাগজপত্র বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করবে। তবেই বাংলাদেশের আশ্বস্ত হওয়ার কারণ ঘটবে।